সরকারি ঔষধ পাচারের অভিযোগ স্টোর কিপার পলির বিরুদ্ধে

সরকারি ঔষধ বাহিরে পাচার করা, স্টক লেজার মেইনটেইন ও সার্ভে কমিটির কাছে রিপোর্ট না দেওয়াসহ নানা অভিযোগ উঠেছে মেহেরপুর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালের স্টোর কিপারর নাসিমা পলির বিরুদ্ধে। এসকল অভিযোগের ভিত্তিতে তাকে কারণ দর্শাণোর নোটিশ দিয়েছেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। নাসিমা পলি মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের এলএমএসএস গোলাম রহমানের খানের মেয়ে।

কয়েক দফায় কারণ দর্শাণোর নোটিশ দিলেও তিনি জবাব দেননি এবং সার্ভে কমিটির কাছে কোন রিপোর্ট পেশ করেননি। জবাব না পেয়ে গত ৭ আগষ্ট স্টোর কিপার নাসিমা পলিকে একদিনের মধ্যে সন্তোষজনক ব্যাখ্যা প্রদানের নোটিশ প্রদান করেন এবং না দিলে উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের কাছে জানানোর কথা উল্লেখ করা হয়।

পরবর্তিতে গত ১৩ আগষ্ট তাকে তিন দিনের মধ্যে কারণ দর্শিয়ে আরও একটি নোটিশ প্রদান করেন হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ। সে নোটিশে বলা হয়েছে, আপনি (স্টোর কিপার) হাসপাতালের সরকারি ওষুধ বাহিরে পাচার করেন। এছাড়া স্টক লেজার মেইনটেইন না করা ও সার্ভে কমিটির নিকট রিপোর্ট প্রদান না করার প্রমান আছে। এ অভিযোগের ভিত্তিতে তিন দিনের মধ্যে উপর্যুক্ত কারণ দর্শাণোর নোটিশ দেওয়া হয়।

মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালের স্টোর কিপার নাসিমা সুলতানা চাকরিতে যোগদান করেন ১৯৮৮ সালে। নাসিমা পলি যোগদানের পর ডেপুটেশনে মেহেরপুর সদর উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা বিভাগে স্বাস্থ্য সহকারী হিসেবে দায়িত্ব পালন করেন কয়েকবছর। পরে আবার স্বপদে ফেরেন মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে। সেই থেকে প্রায় দুই যুগেরও বেশি সময় ধরে চাকরি করছেন একই কর্মস্থলে। কিন্তু সরকারি চাকরিতে একই কর্মস্থলে তিন বছরের বেশি থাকার বিধান নেই। রাজনৈতিক ক্ষমতায় তিনি একই কর্মস্থলে থাকছেন যুগের পর যুগ। নাসিমা পলির আপন ভাই আব্দুর রহমান মন্টু একজন কুয়াক দন্ত চিকিৎসক। তার ওই ভাই ও হাসপাতালের কিছু দালালের মাধ্যমে সরকারি ওষুধ বাহিরে পাচার করার অভিযোগ রয়েছেন নাসিমা পলির বিরুদ্ধে। মেহেরপুরের বিভিন্ন ওষূধের দোকানে পুলিশের অভিযানে সরকারি ওষুধ পাওয়ার খবর পাওয়া গেছে এবং যেগুলো বিভিন্ন গণমাধ্যমে সংবাদ

প্রকাশ হয়েছে।

হাসপাতাল এলাকার কয়েকজন ওষুধ দোকানদার নাম প্রকাশ না করার শর্তে জানান, স্টোর কিপার নাসিমা পলি সরকারি ইনসুলিন, এন্টিবায়েটিকসহ বিভিন্ন সরকারি ওষুধ তার পছন্দের কিছু দোকানে বিক্রি করেন। হাসপাতালের হিসাবরক্ষক মীর হাবিবুর রহমানের যোগসাজশে তিনি এসকল অপর্কম করেন বলে অভিযোগ করেন তারা।

মেহেরপুর ২৫০ শয্যা জেনারেল হাসপাতালের তত্ত্বাবধায়ক ডা. হাসিব মো. জমির সাত্তার বলেন, স্টোর কিপার নাসিমা পলির বিরুদ্ধে বিভিন্ন অভিযোগের প্রেক্ষিতে তাকে বিভিন্ন সময় মৌখিক ও লিখিতভাবে সতর্ক করা হয়েছে। উর্দ্ধতন কর্তৃপক্ষের কাছে তার বিরুদ্ধে বলেও লাভ হয়নি। রাজনৈতিক প্রভাব খাটিয়ে তার অপকর্ম থেকে পার পেয়ে যায়। তার কাছে রিপোর্ট চেয়ে নোটিশ করা হয়েছে। রিপোর্টে গরমিল পেলে আইনানুগ ব্যবস্থা গ্রহণ করা হবে।

মেহেরপুরে ভয় ধরাচ্ছে ‘এ্যানথ্রাক্স’

স্বাস্থ্য বিভাগ ও প্রাণি সম্পদ বিভাগের উদাসিনতা, অন্যদিকে মানুষের মধ্যে অসচেতনতার কারনে মেহেরপুরে দিনদিন এ্যানথ্রাক্স রোগ ছড়িয়ে পড়ছে উদ্বেগ জনক হারে। গাংনী উপজেলায় গত ছয় মাসে প্রায় চার শাতধিক এ্যানথ্রাক্স রোগী সনাক্তসহ উপজেলায় গত দশ বছরে অন্তত ৫ হাজার নারী পুরুষ এ রোগে আক্রান্ত হয়ে চিকিৎসা নিয়েছেন। স্বাস্থ্য বিভাগ রোগ সনাক্ত ও কিছু ঔষধ দিয়েই তার দায়িত্ব শেষ করেন। আর প্রাণি সম্পদ বিভাগ ঠুটো জগন্নাথ! দ্রত সময়ে এ রোগ প্রতিরোধ করা না গেলে মারাত্নক ভাবে স্বাস্থ্য ঝুঁকিতে পড়বে বলে আতংকিত অনেকেই। রোগ প্রতিরোধ ও নিয়ন্ত্রণে স্বাস্থ্য বিভাগ ও প্রাণি সম্পদ বিভাগের তেমন তৎপরতা দেখা না গেলেও তাদের দাবী এ্যানথ্রাক্স প্রতিরোধে তারা সচেষ্ট।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের রেকর্ডকৃত তথ্য বলছে, ২০১৩ সালে গাংনী উপজেলার ভারতীয় সীমান্তের কাজিপুর ও হাড়াভাঙ্গা

গ্রামে প্রথম এ্যানথ্রাক্স রোগ সনাত্ব হয়। সেবছরেই আক্রান্ত গরু, মহিষ ও ছাগলের মাংসের সংস্পর্শে ১৯৯ জন রোগী এ্যানথ্রাক্স রোগে আক্রান্ত হয়ে সরকারি হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়েছেন। আবার অনেকেই বিভিন্ন ক্লিনিকে চিকিৎসা নিয়েছেন। তারপর থেকে এরোগ পর্যায়ক্রমে ছড়িযে পড়ে জেলার বিভিন্ন গ্রামে। ২০১৪ সালে ২০৩ জন, ২০১৫ সালে ১৫৪ জন, ২০১৬ সালে ২৪০ জন, ২০১৭ সালে ২৮১ জন, ২০১৮ সালে ৪০৮ জন, ২০১৯ সালে ৬৬০ জন, ২০২০ সালে ৩৭৭ জন, ২০২১ সালে ৪১৭ জন, ২০২২ সালে ৬৪৪ জন, ২০২৩ সালে ৭৯৪ জন, এ উপজেলায় সর্বমোট এপর্যন্ত ৪ হাজার, ৮১৯ জন নারী পুরুষ এ্যানথ্রাক্স রোগে আক্রান্ত হয়েছেন এবং চিকিৎসা নিয়েছেন। এদের অনেকেই মারাত্নক আক্রান্ত হওয়ায় ঢাকাসহ বিভিন্ন জায়গায় উন্নত চিকিৎসা নিতে হয়েছে।

এদিকে ২০২৪ সালের জানুয়ারী থেকে জুন পর্যন্ত অর্থাৎ ছয় মাসে ৩৮৯ জন রোগী ইতোমধ্যে এনথ্রাক্স রোগে আক্রান্ত হয়েছেন। আক্রান্তদের মধ্যে বয়স্ক নারী পুুরুষের পাশাপাশি শিশুদেরও আক্রান্ত হওয়ার তথ্য রয়েছে। বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকরা এ্যানথ্রাক্স রোগে আক্রান্ত গরু, মহিষ, ছাগল এবং ভেড়ার মাংস স্পর্শ করে মানবদেহে ছড়িয়েছে। তবে এ্যানথ্যাক্স জীবুণু মাটিতেও থাকে বলে জানিয়েছেন। কারও শরীরে ক্ষত থাকলে তাকে দ্রত সময়ে এরোগে আক্রান্ত হতে হয়।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে সদ্য চিকিৎসা নিতে আসা গাংনী উপজেলার বেতবাড়িয়া গ্রামের দবির উদ্দিনের স্ত্রী মাজেদা খাতুন বলেন, গ্রামে একটি ছাগল হঠাৎ অসুস্থ্য হলে তা জবাই করে ছাগল মালিক। ওই ছাগলের গোস্ত কিনে আমি তা নাড়াচাড়া করার সাথে সাথে আমার দু’হাত জ্বালাপোড়া করতে থাকে। কয়েক ঘন্টার মধ্যে আমার হাতে ফোষ্কা উঠলে হাসাপাতালে এসে শুনছি এটি এ্যানথ্রাক্স রোগ। ওই গ্রামের কল্পনা খাতুন বলেন,বাজার থেকে গরুর মাংস কিনে আনেন আমার স্বামী। সেই মাংস রান্নার জন্য প্রস্তত করি। সে সময় আমার দুই হাতের আ্গং◌ুল জ্বালাপোড়া শুরু হয়। পরে তা ফোস্কা হয়ে ক্ষত সৃষ্টি হলে আমি হাসপাতালে চিকিৎসা নিয়ে দুই সপ্তাহ পরে সুস্থ্য হই।

ছাতিয়ান গ্রামের রাশেদুলের স্ত্রী, আয়শা খাতুন ও কাবের উদ্দীন জরুরী বিভাগে চিকিৎসা নিতে আসলে তাদের শরীরেও এ্যানথ্রাক্স রোগ সনাক্ত হয়। পরে তাদের ১০দিন চিকিৎসা নিতে হয়।

চর্ম বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক ডাক্তার মো: রোকনুজ্জামান বলেন, যাদের

শরীরে ঘাঁ কিংবা পচড়ার মত কোন ক্ষত থাকে তাদের শরীরে এ্যানথ্রাক্স জীবাণু খুব দ্রত আক্রান্ত হয়। তবে রান্না করা মাংসে এ জীবাণুর কার্যকারিতা নষ্ট হয়ে যায়।

তিনি আরও বলেন, কোন গবাদী পশুর মাংস খুবই সর্তকতার সাথে নাড়াচাড়া করতে হবে এবং অবশ্যই হাতে গ্লাভস পরে যে কোন পশুর মাংস স্পর্শ করা উচিৎ। তার পরেও কারও শরীরে এমন লক্ষণ দেখা গেরে দ্রত চিকিৎসকের সরনাপন্ন হওয়ার পরামর্শ দেন এই চিকিৎসক।

গাংনী উপজেলা প্রাণি সম্পদ কর্মকর্তা (ভারপ্রাপ্ত) ডাক্তার আরিফুল ইসলাম জানান, আমরা এ্যানথ্রাক্স আক্রান্ত পশুকে জবাই না করার জন্য মানুষের মধ্যে সচেতনতা তৈরী করছি। তবে বর্ষা মৌসুমে এরোগ বৃদ্ধি পায়। আক্রান্ত পশুকে দ্রত হাসপাতালে নিয়ে আসতে পরামশৃ দিচ্ছি। এছাড়াও আমাদের মাঠকর্মীরা ভ্রাম্যমাণ টিমেও কাজ করছে।

গাংনী উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের রোগ নিয়ন্ত্রণ কর্মকর্তা ডাক্তার আদিলা আজহার বলেন, এক সময় গাংনীর কাজিপুর, সাহেবনগর, হাড়াভাঙ্গা এলাকায় এ্যানথ্রাক্স রোগের পাদুর্ভাব ভয়াবহ আকারে ছড়িয়ে পড়ে। আমরা বিভিন্ন গ্রামে গ্রামে এ্যানথ্রাক্স বিষয়ে জনসচেতনতা সৃষ্টি করার চেষ্টা অব্যাহত রেখেছি।

উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা (ইউএইএফপিও) ডা. সুপ্রভা রানী বলেন, গাংনী উপজেলা এ্যানথ্রাক্স রোগের ডেন্জার জোন হিসেবে পরিনত হয়েছিল। স্বাস্থ্র বিভাগের পক্ষ থেকে সেই মহামারিকে প্রতিরোধ করতে সক্ষম হয়েছি। এখনও এ রোগে আক্রান্ত রোগীরা আসলে চিকিৎসকরা ওইসব রোগীদের গুরুত্বের সাথে চিকিৎসা দিয়ে থাকেন। তবে মানুষকেও সচেতন হতে পরামর্শ দেন তিনি।

হার্ট ভালো রাখুন ৩ উপায়ে

চারপাশে অস্থির সময়। দৈনন্দিন কাজ থেকে শুরু করে অফিস, আদালত, রাস্তাঘাট সর্বত্র উত্তেজনা বিরাজ করছে। তাই মানসিক চাপ কমানো অনেক ক্ষেত্রেই সম্ভব হয়ে ওঠে না। হৃদয়েরও তাই খেয়াল রাখা কঠিন

হয়ে ওঠে। দুশ্চিন্তা, অত্যধিক উদ্বেগ হৃদরোগের অন্যতম কারণ। সুস্থ থাকতে হলে জীবনে কিছুটা তো পরিবর্তন আনতেই হবে। রইলো তিন পরামর্শ:

শরীরচর্চার অনীহা নয়
সুস্থ থাকতে হলে শরীরচর্চার বিকল্প হয় না। তবে না বুঝে শুধু শরীরচর্চা করলেই হবে না জানতে হবে নিয়মাবলী। কী ধরনের ব্যায়াম করবেন, কত ক্ষণ ধরে করবেন, রোজই করবেন কি না। এই বিষয়গুলো স্পষ্ট হওয়া জরুরি। হার্ট ভালো রাখার জন্য কার্ডিয়ো ব্যায়াম জরুরি। কার্ডিয়ো ব্যায়ামের মধ্যে হাঁটা বা দৌড়ানো কিংবা ব্যাডমিন্টন খেলতে পারেন। সাইকেল কিংবা সাঁতারও কিন্তু চমৎকার ব্যায়াম।

রোজ নিয়ম করে আধ ঘণ্টা শরীরচর্চা করুন। খুব ব্যস্ততা থাকলে সকাল ও বিকাল দুই বেলা মিলিয়েও করতে পারেন। সপ্তাহে অন্তত ৫ দিন নিয়ম করে শরীরচর্চা করুন। বয়সও শরীরের অবস্থা বিবেচনা ব্যায়াম করুন। প্রয়োজনে অভিজ্ঞ প্রশিক্ষকের পরামর্শ নিন।

স্বাস্থ্যকর ডায়েট
আজকাল রোগা হতে চান কমবেশি সবাই। কিন্তু আবার তেল-ঝোল, মশলাদার খাবার, ভাজাভুজি ছাড়া যেন মুখে রোচেই না। রোজ রোজ নতুন রেস্টুরেন্ট, নতুন মেন্যু এক্সপ্লোর করা এখন ট্রেন্ড। এছাড়াও প্রক্রিয়াত ও প্যাকেটজাত খাবার তো হারহামেশাই খাওয়া হয়। ডায়েটে এসব অস্বাস্থ্যকর খাবার হার্টের রোগের ঝুঁকি বাড়ায়। অল্প বয়সে হার্ট অ্যাটাকে আক্রান্ত হচ্ছেন, এমন রোগীর সংখ্যাও দিন দিন বাড়ছে। তাই হৃদয় সুস্থ রাখতে হলে স্বাস্থ্যকর ডায়েট ভীষণ জরুরি।

হার্ট ভাল রাখতে সুষম খাবার খান। পাতে রাখুন ঘরে তৈরি খাবার। যেমন, ভাত, রুটি, ডাল, সবজি, ডিম, মাছ, মাংস, ফলমূল, দুধ সব মিলিয়েই খেতে হবে। ডায়েটে রাখুন ডাল যা প্রোটিনের চাহিদা মেটাবে। খান প্রচুর সবুজ শাকসবজি যা ফাইবার, খনিজ, ভিটামিনের চাহিদা পূরণ করবে। শর্করার চাহিদা পূরণে ভাত-রুটি তো ডায়েটে থাকেই। ওমেগা ৩ ফ্যাটি অ্যাসিডের জন্য মাছ জরুরি। দুধ খেতে না পারলে ছানা, পনির, টোফু খেতে পারেন। প্রোবায়োটিকের চাহিদা মেটাবে টক দই।

মিষ্টি নয়
অনেকেরই শেষপাতে একটু মিষ্টি না হলে চলে না। তবে মিষ্টি এড়িয়ে

যাওয়ারই পরামর্শ দিয়ে থাকেন হৃদরোগ বিশেষজ্ঞরা। চিনি অন্তত দুই সপ্তাহের জন্য বন্ধ করলেই তফাৎটা বুঝতে পারবেন। দেখবেন, অতিরিক্ত মেদ কমে গেছে শরীরে সেইসঙ্গে রক্তচাপের ওঠানামা কমছে। উচ্চ কোলেস্টেরলের সমস্যা থাকলে সেটিও থাকবে নিয়ন্ত্রণে।

সূত্র: ইত্তেফাক

যোগব্যায়ামের মাধ্যমে থাকুন ফিট

মানুষের দেহ, মন ও এনার্জি বা শক্তি- এ তিনটি জিনিসের সমন্বয়ে আমাদের শরীর চলে। এর কোনো একটি যদি ঠিকঠাক কাজ না করে তাহলে আমাদের শরীর ঠিকভাবে কাজ করবে না। আর ইয়োগা বা যোগব্যায়ামের কাজ হলো শরীর, মন ও আত্মার সমন্বয় ঘটিয়ে শান্তি ও সুস্বাস্থ্য বজায় রাখতে সহায়তা করা।

যোগব্যায়ামের ইংরেজি নাম ইয়োগা, যার সাধারণ অর্থ ইউনিয়ন বা মিলন। সুতরাং শরীর, মন ও আত্মার মিলনে প্রাচীনকাল থেকে এ উপমহাদেশে শরীরকে সুস্থ রাখার অন্যতম মাধ্যম হচ্ছে যোগব্যায়াম বা ইয়োগা।

ইয়োগা কোনও একটি ব্যায়ামের নাম নয়। এটি তিন ধরনের চর্চার সমন্বয়-আসন, প্রাণায়াম ও ধ্যান। ইয়োগার আসনেরও আছে অনেক ধরণ।

যোগব্যায়াম
আজকাল ফিটনেসের ক্ষেত্রে নিয়মিত যোগব্যায়ামকেই প্রাধান্য দিচ্ছেন আধুনিক ফিজিওথেরাপিস্টরাও। এক্ষেত্রে ফিজিওলোজিস্ট মাইশা মোমতাজ একজন সুস্থ ও ফিটফাট মানুষ হিসেবে বাঁচতে হলে নিয়মিত ইয়োগা বা যোগব্যায়াম করার পরামর্শ দিয়েছেন।

. নিয়মিত ইয়োগা বা যোগব্যায়াম করলে শরীরে অক্সিজেন ও প্রয়োজনীয় পুষ্টির সঠিকভাবে সঞ্চার ঘটে। যার ফলে শরীরে রক্ত সঞ্চালনও সঠিকভাবে বজায় থাকে। অন্যদিকে, এই কারণের জন্য শরীরে উচ্চ

রক্তচাপের মাত্রা থাকলে তাও ধীরে ধীরে স্বাভাবিক মাত্রায় চলে আসে। অন্যদিকে রক্ত সঞ্চালনের জন্য শরীরের পাশাপাশি ত্বকও ভাল থাকে।
. যাদের হাঁপানির টান বা শ্বাসকষ্ট ও ফুসফুসের সমস্যা রয়েছে, তারা
নিয়মিত যোগব্যায়াম করলে ধীরে ধীরে তাদের সমস্যাও কমে যায় এবং সচল থাকে।
. নিয়মিত যোগব্যায়াম করলে হজম ক্ষমতাও বৃদ্ধি পায়। যাদের গ্যাস,
অম্বলের সমস্যা রয়েছে তাদের ফিট থাকতে যোগব্যায়ামের বিকল্প নেই। পাচনতন্ত্র সঠিকভাবে কাজ করলে শরীরে একাধিক রোগ কমে যায়। পাচনতন্ত্র যত সঠিকভাবে কাজ করবে, ওজন নিয়ন্ত্রণ করাও তত সহজ হবে। সুতরাং ওজন যদি নিয়ন্ত্রণে রাখতে চান তাহলে যোগব্যায়াম অবশ্যই করতে হবে।
. শরীরে পর্যাপ্ত পরিমাণে সোডিয়াম না থাকলে নানা রকমের সমস্যা
দেখা দেয়, যেমন রক্তচাপ কমে যাওয়া, থাইরয়েড ইত্যাদি। অন্যদিকে সোডিয়াম মাত্রা বজায় রাখতে সাহায্য করে খাদ্যের পাশাপাশি যোগব্যায়াম। যোগব্যায়াম রক্তে কোলেস্টেরলের মাত্রা নিয়ন্ত্রণ করে, যার ফলে হ্রাস পায় হৃদরোগের ঝুঁকিও। অন্যদিকে ট্রাইগ্লিসারাইডের মাত্রাও নিয়ন্ত্রণে রাখতে সাহায্য করে যোগাসন।

যোগব্যায়াম
. ট্রাইগ্লিসারাইডের মাত্রা বেড়ে গেলে ডায়াবেটিসের মত সমস্যা দেখা
দেয় শরীরে। এই কারণে ডায়াবেটিসের রোগীদের সব সময় যোগ ব্যায়াম করার পরামর্শ দেওয়া হয়।
. যোগ ব্যায়াম করলে যে শরীরে রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বৃদ্ধি পায়
এই বিষয়ে কোনও সন্দেহ নেই। লাল রক্তকণিকার পরিমাণ সঠিক থাকার অর্থ হল হিমোগ্লোবিনের মাত্রা ঠিক থাকা। এর ফলে অ্যানিমিয়ার মত রোগের হাত থেকে মুক্তি পাওয়া যায়। রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা যেহেতু বাড়ে, যোগাসন করলে রক্তে লাল লোহিত কণিকার পরিমাণও বেড়ে যায়।
. বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গেই শরীরের নানান জায়গায় ব্যথা দেখা যায়।
যোগাসন করলে আর্থারাইটিসের সমস্যা থেকেও মুক্ত পাওয়া যায়। অন্যদিকে, মাইগ্রেনের মত স্নায়ুর সমস্যাকেও প্রতিরোধ করে যোগাসন।
. এছাড়াও ইয়োগার নানা আসন শরীরের বিভিন্ন পেশি ও অঙ্গের শক্তি
এবং নমনীয়তা বৃদ্ধি করে। নিয়মিত যোগচর্চার মাধ্যমে অসুস্থ শরীর রোগমুক্ত ও সুস্থ হয়ে ওঠে এবং সুস্থ শরীর আরও তেজ ও সতেজ হয়ে উঠে।

সূত্র: ইত্তেফাক

ঝিনাইদহে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প অনুষ্ঠিত

ঝিনাইদহ পৌরসভার আয়োজনে ৬ দিন ব্যপী ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়েছে। ঝিনাইদহ পৌরসভার আয়োজনে এ ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্প অনুষ্ঠিত হয়।

ঝিনাইদহ পৌরসভার মেয়র কাইয়ুম শাহরিয়ার জাহেদী হিজলের সভাপতিত্বে ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পের উদ্বোধন করেন ঝিনাইদহ সিভিল সার্জন শুভ্রা রানী দেবনাথ।

সেসময় উপস্থিত ছিলেন পৌরসভার সকল কাউন্সিলরবৃন্দ। পৌরসভার ৯টি ওয়ার্ডে এই ফ্রি মেডিকেল ক্যাম্পের মাধ্যমে রোগ নির্নয় করে রোগীদের বিনামুলে সকল প্রকার ঔষধ বিতরণ করা হয়। এই চিকিৎসা সেবা পেয়ে পৌরবাসী সন্তুষ্টি প্রকাশ করেন।

কোলেস্টেরল বশে রাখবে ৫ শরীরচর্চা

আজকাল অল্পবয়সীদের শরীরেও দেখা দিচ্ছে কোলেস্টেরলের সমস্যা। নানা অনিয়ম, ব্যস্ততা ভরা জীবনে শরীরে খারাপ কোলেস্টেরলের মাত্রা বেড়ে যায়। তাই সচেতনতা জরুরি। প্রতিদিনের রুটিনে কিছু শরীরচর্চা যোগ করে নিয়ন্ত্রণে রাখুন কোলেস্টেরল।

হাঁটুন
আপনি ভীষণ অলস? কোন শরীরচর্চায়ই মন বসাতে না পারলে হাঁটুন।

অন্তত ২০ মিনিট রোজ হাঁটুন। বাইরে যেতে না পারলে বাড়িতেই হাঁটুন। বাড়ির ছাদ, বারান্দা কিংবা বাড়ির সামনের রাস্তাটাকে কাজে লাগান। রোজ নিয়ম করে হাঁটলে নিয়ন্ত্রণে থাকবে কোলেস্টেরল।

দৌড়ান
যদি অলসতার মাত্রা আপনার কিছুটা কম হয় সেক্ষেত্রে দৌড়াতে পারেন। চিকিৎসকদের মতে, রোজ নিয়ম মেনে হাঁটার পাশাপাশি সময় বের করে মোটে দশ মিনিট দৌড়ালে সারা শরীরের শরীরচর্চা হয়। দৌড়ানোর সময় শ্বাসপ্রশ্বাসের ব্যাপারে খেয়াল রাখুন। পা ফেলার সঙ্গে তাল মিলিয়ে শ্বাস নিন এবং শ্বাস ছাড়ুন। শুরুতে রোজ ১০ মিনিট করে দৌড়ান। অভ্যাস হয়ে গেলে ধীরে ধীরে সময় বাড়ান।

সাইকেল চালান
সাইকেল চালানো ভীষণ উপকারী শরীরচর্চা। চিকিৎসকদের মতে, সাইকেল চালালে শরীরের পাশাপাশি মনও ভালো থাকে। এতে সারা শরীরের ব্যায়াম হয়। নিয়মিত সাইকেল চালালে রক্তে খারাপ কোলেস্টেরলের মাত্রা নিয়ন্ত্রণে থাকে। ভালো থাকে হার্ট, সঙ্গে পেশির গঠনও মজবুত হয়। মনের খেয়াল রাখতেও সাহায্য করে এই শরীরচর্চা।

সাঁতার কাটুন
সাঁতার একটি দারুণ শরীরচর্চা। এতে শরীরের একাধিক পেশি একসঙ্গে কাজ করে। যেকোনো ব্যথা, যন্ত্রণায় স্বস্তি দেয় সাঁতার। এতে রক্ত সঞ্চালন ভালো হয়। কমে শরীরে খারাপ কোলেস্টেরলের মাত্রা।

যোগাসন করুন
নিয়মিত যোগাসন করলে কোলেস্টেরল সহ নানা রোগের হাত থেকে রক্ষা পাবেন। কোলেস্টেরল কমাতে সর্বাঙ্গাসন করতে পারেন। চিত হয়ে শুয়ে পা দু’টি জোড়া করে ওপরে তুলুন। এবার দু’হাতের তালুতে কোমরের ভার দিয়ে পিঠ এমন ভাবে ঠেলে তুলুন, যেন ঘাড় থেকে পা পর্যন্ত এক সরল রেখায় থাকে। থুতনিটি বুকের সঙ্গে লেগে থাকবে। চোখ রাখবেন পায়ের আঙুলের দিকে। শ্বাস-প্রশ্বাস স্বাভাবিক রাখুন। ৩০ সেকেন্ড এভাবে থেকে শবাসনে বিশ্রাম নিন। তিন বার অভ্যাস করুন এই আসন।

সূত্র: ইত্তেফাক

গাংনী উপজেলা স্বস্থ্য কমপ্লেক্স, কাংখিত চিকিৎসা পাচ্ছেনা উপজেলাবাসী

জনবল ও চিকিৎসক সংকটে জোড়াতালি দিয়ে চলছে মেহেরপুর জেলার গাংনী উপজেলা স্বস্থ্য কমপ্লেক্সের চিকিৎসা সেবা। প্রায় চার লক্ষাধিক মানুষের চিকিৎসার একমাত্র ভরসা উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসক সংকট থাকায় কাঙ্খিত চিকিৎসা পাচ্ছেননা এমন অভিযোগ উপজেলাবাসীর। জনবল সংকটের কারনে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সটি চলছে জোড়াতালি দিয়ে। চিকিৎসা দিতে গিয়েও হাপিয়ে উঠছেন চিকিৎসকরা। অত্যাধুনিক অপারেশন থিয়েটার থাকলেও ডাক্তারের অভাবে তা বন্ধ। ফলে কোন কাজে আসছেনা প্রায় কোটি টাকা মুল্যেও অপারেশন থিয়েটার। তবে কর্তৃপক্ষ বলছেন এ সমস্যার সমাধান খুঁজে পাচ্ছিনা। অনেক কষ্ট করেই চালাতে হচ্ছে চিকিৎসা কার্যক্রম।

জানা গেছে, মেহেরপুরের তিনটি উপজেলার সবচেয়ে জনবহুল উপজেলা গাংনীবাসীকে চিকিৎসা সেবা নিশ্চিত করনের লক্ষ্যে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সটি ৩১ শয্যা থেকে ৫০ শয্যায় উন্নীত করা হয়। কিন্তু সে মোতাবেক জনবল ও চিকিৎসক দেয়া হয়নি।
স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সটিতে ১০ জন জুনিয়র কনসালটেন্ট সহ মোট ২১ জন চিকিৎসক থাকার কথা থাকলেও এ হাসপাতালে রয়েছেন মাত্র ১১ জন। যদিও খাতা-কলমে দায়িত্ব পালন করছেন ১২ জন। জুনিয়র কনসালটেন্ট (সার্জিক্যাল) একজন মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে ডেপুটিশনে রয়েছেন।

এছাড়াও স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে দু’টি উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন জেনারেটর থাকলেও তা বন্ধ রয়েছে দীর্ঘদিন। বিদ্যুৎ চলে গেলেই স্বাস্থ্য কমপ্লেক্স হয়ে ওঠে অন্ধকারচ্ছন্ন। মোবাইলের লাইট জ্বলিয়ে দিতে হয় চিকিৎসা সেবা।

অপরিচ্ছন্নতা, ওয়ার্ডে পানি ও বিদ্যুতের সমস্যা, ময়লা ও দুর্গন্ধযুক্ত বাথরুমসহ নানা সমস্যা রয়েছে স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সটিতে।

স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের পরিসংখ্যান কর্মকর্তা মো: মনিরুল ইসলাম জানান, ১৯৬৮ সালে নির্মিত হয় গাংনী উপজেলা ৩১ শয্যার স্বাস্থ্য

কমপ্লেক্সটি। উপজেলার ৯টি ইউনিয়ন, একটি পৌরসভাসহ অন্তত সাড়ে চার লাখ মানুষের স্বাস্থ্যসেবার একমাত্র সরকারি হাসপাতাল এটি। ২০০৮ সালে ৩১ শয্যার হাসপাতালটি ৫০ শয্যায় উন্নীত হলেও সেবার মান আজও বাড়েনি। দেয়া হয়নি চাহিদা মতো জনবল ও চিকিৎসক।

সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, হাসপাতালে মোট ১০টি জুনিয়র কনসালটেন্ট চিকিৎসকের পদ থাকলেও খাতা-কলমে রয়েছেন ৪ জন। আর হাসপাতালে কর্মরত রয়েছেন ৩ জন। বাকি ১ জন অন্যত্র ডিউটিতে থাকেন। একজন এনস্থেসিয়া থাকলেও হাসপাতালে তার দেখা পাওয়া ভার। সার্জিক্যাল কনসালটেন্ট না থাকায় বন্ধ অপারেশন।

গাইনী, চক্ষু, অর্থপেডিক্স, কার্ডিওলজি, ইএনটি (নাক কান গলা) এবং চর্ম যৌন রোগের জন্য অতিব গুরুত্বপূর্ণ কনসালটেন্ট চিকিৎসকের পদ থাকলেও পদগুলি দীর্ঘদিন শুন্য থাকায় গাংনীবাসী কাঙখিত চিকিৎসা সেবা থেকে বঞ্চিত হচ্ছেন।

২০২৩ সালের জানুয়ারীতে ইলেক্ট্রিশয়ানের(জুনয়র মেকানিক) পদটি মৃত্যু জনিত কারনে শূন্য হলেও আজও ইলেক্ট্রিশিয়ান দেয়া হয়নি ফলে হাসপাতালে বৈদ্যতিক ত্রুটি হলেই ফ্যান লাইটসহ সব যন্ত্রপাতি বন্ধ হয়ে যায়। হাসপাতাল হয়ে পড়ে ভুতুড়ে অবস্থা। ৩টি অফিস সহকারির পদ থাকলেও সবই শুন্য। ওয়ার্ড বয় পদ ৩টি এ পদই ২০২২ সাল থেকে রয়েছে শুন্য। ২০২১ সাল থেকে ২জন নৈশ্য প্রহরীর পদ থাকলেও দুটি পদই শুন্য। ৫জন পরিচ্ছন্নতাকর্মীর পদ থাকলেও মাত্র ১জন পরিচ্ছন্নতাকর্মী রয়েছেন। তিনিও ঠিকমতো হাসপাতালটিতে আসেননা বলে অভিযোগ রোগী সাধারনের। মশালচি(কুক) পদে দুটি পদ থাকলেও আছে ১জন। ফলে ভর্তি রোগীদের খাবার সরবরাহ একার জন্য খুবই মুশকিল হয়ে পড়ে। রোগীদের সময়মত খাবার সরবরাহ করতে পারেনা।

হাসপাতালে প্রতিদিন তিন থেকে চার শতাধিক রোগী চিকিৎসা সেবা নিতে আসেন। ভর্তি হন ৩৫-৪০ জন। চিকিৎসা দিতে না পারায় বেশিরভাগ রোগীকে উন্নত চিকিৎসার কথা বলে জেলা হাসপাতালসহ বিভিন্ন হাসপাতালে রেফার্ড করা হয়।

গত বছর ২০২৩ সালের জানুয়ারী থেকে ৩০ ডিসেম্বও প্রর্যন্ত এ স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে বহির্বিভাগে চিকিৎসা নিয়েছেন ১ লক্ষ ৭ হাজার ২৪৩জন। চলতি বছরের জানুয়ারী থেকে জুন পর্যন্ত স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের বহির্বিভাগে চিকিৎসা নিয়েছেন ৫০ হাজার ২৯৪ জন রোগী।

হাসপাতালের একমাত্র এক্স-রে মেশিনটি মাঝে মধ্যে ঠিক হলেও ফিল্ম

থাকে না। দুটি অপারেশন থিয়েটার থাকলেও চিকিৎসকের অভাবে অব্যবহৃত পড়ে থাকে বছরের পর বছর। প্যাথলজি বিভাগ থাকার পরও পরীক্ষা- নিরীক্ষার জন্য রোগীদের বাইরের ক্লিনিকে পাঠানো হয়।

হাসপাতালে চিকিৎসা নিতে আসা উপজেলার লক্ষী নারায়নপুর ধলা গ্রামের বিলকিস খাতুন জানান, জরুরী বিভাগ থেকে ডাক্তার রোগের কয়েকটি পরীক্ষা-নিরীক্ষার জন্য বাইরে থেকে করিয়ে আনতে বলেন। আমরা গরীব মানুষ। টাকা দিয়ে বাইরে থেকে টেস্ট করানোর অবস্থা নেই। হাসপাতালের যন্ত্রপাতি ও ডাক্তার থাকলে আমাদের খুবই উপকার হতো। তিনি আরও জানান,১২টা বাজলে আর কোন পরিক্ষা করানো হয়না হাসপাতালে। তখন রোগীরা নিরুপাই হয়ে প্রাইভেট ক্লিনিক বা ডায়াগনস্টিক সেন্টার থেকে পরিক্ষা করাতে হচ্ছে।

অসুস্থ মাকে নিয়ে হাসপাতালে আসা কাথুলী গ্রামের আরজিয়া খাতুন বলেন, সকাল ৮টার দিকে হাসপাতালে এসেছি। সাড়ে ১১টা বাজলো। রোগীদেও অনেক ভীড়, এখনও আমার রোগী দেখলো না। সেবা নিতে এসে আমরা সেবা পাচ্ছি না।

উপজেলার আমতৈল গ্রামের আব্দুর রহমান বলেন, পেটের সমস্যা নিয়ে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে যাই। কিন্তু বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক না থাকায় মেডিকেল অফিসার ব্যবস্থাপত্র দিয়েছেন। কিন্তু ওষুধ খেয়ে অবস্থার কোনো উন্নতি হয়নি।

বাঁশবাড়িয়া গ্রামের সাইদুল ইসলাম জানান, তিনি পায়ের ক্ষত নিয়ে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে চিকিৎসা নিতে যান। সার্জারি বিভাগে বিশেষজ্ঞ চিকিৎসক না থাকায় তাকে ১২ কিলোমিটার দুরে মেহেরপুর জেনারেল হাসপাতালে যেতে হয়েছে।

এ বিষয়ে উপজেলা স্বাস্থ্য ও পরিবার পরিকল্পনা কর্মকর্তা ডাক্তার সুপ্রভা রানী বলেন, হাসপাতালটি ৫০ শয্যায় উন্নীত হলেও প্রয়োজনীয় সংখ্যক জনবল বাড়ানো হয়নি। ১১জন চিকিৎসক দিয়ে চলছে চিকিৎসা সেবা। প্রতিদিন সকাল থেকে দুপুর পর্যন্ত রোগীদের ভীড় থাকে। এসকল রোগীদেও চিকিৎসা দিতে গিয়ে চিকিৎসকরা হিমশিম খেয়ে যায়। হাসপাতালে চিকিৎসক, তৃতীয় ও চতুর্থ শ্রেণির জনবল সংকট রয়েছে। জরুরী ভিত্তিতে শূন্য পদে জনবল ও চিকিৎসক পূরণ হলে চিকিৎসা সেবা দেয়া সম্ভব।

বর্ষায় পানিবাহিত রোগ এড়াতে যা করণীয়

বর্ষা এলেই পেটের সংক্রমণ নিয়ে ভাবনা থাকে সবার। বৃষ্টি শুরু হয়ে যাওয়ায় জলবাহিত অসুখের প্রকোপ অনেক বেড়ে যায়। বৃষ্টির পানি অনেক সময় আন্ত্রিক অর্থাৎ ডায়রিয়ার মতো রোগ ছড়ায়। বিশেষত গ্রামাঞ্চলে এই সমস্যা প্রকট। পেট খারাপ, বমি, ডিহাইড্রেশনের মতো সমস্যায় ভুগছেন অনেকে। পানি ঠিকঠাক ফিল্টার করতে না পারাও একটি বড় সমস্যা। এছাড়া আরও কিছু জটিল বিষয়ে একটু মনোযোগ দেওয়া দরকার। পর্যবেক্ষণ ও তদারকিই এখানে আসল।

ব্যাকটেরিয়ার প্রকোপ প্রথম ভাবনায়
পেটের রোগ এই সময়ের সবচেয়ে বড় সমস্যা। কারণ হলো ব্যাকটেরিয়ার প্রকোপ। ই-কোলাই ব্যাকটেরিয়া সচরাচর মলে থাকে। তাই মলের বা বাথরুমের পানি কোনো কারণে যদি সুপেয় পানির সংস্পর্শে আসে তখন বিপত্তি বাঁধে। টাইফয়েড, ক্লসটিডিয়াম, সিরেলা, সালমোনেলা থেকেও সংক্রমণ হয়। খাবার পানি থেকেই আপনার পানিবাহিত রোগ হবে এমন ধারণা ভুল। দূষিত পানিতে গোসল করলে, মুখ-হাত ধুলে হতে পারে। বিশেষত অনেকে বর্ষায় কোথাও ঘুরতে গেলে পুকুরে নামেন। বৃষ্টিতে ভেজেন। আবার সড়কে পানি জমলে তার ওপর দিয়ে হেঁটে আসার পর পরিচ্ছন্ন হন না। সুইমিং পুলের অপরিষ্কার পানিতে সাঁতার কাটার সময়েও কয়েক ফোঁটা মুখে ঢুকে গেলে সংক্রমণের আশঙ্কা থাকে।

সাবধান থাকা জরুরি
আপনার প্রস্রাব ঠিকমতো হচ্ছে কি-না দেখতে হবে। যদি না হয় তাহলে ওআরএস দিতে হবে। ওআরএস দেওয়ার পরে বমি হতে পারে। ভয় পাওয়ার কিছু নেই। মুখ ধুয়ে আবার ওআরএস দিতে হবে। শরীরে সোডিয়াম ক্লোরাইড, সোডিয়াম বাইকার্বোনেট, পটাশিয়াম ক্লোরাইড ঢুকলে ইলেকট্রোলাইটের ভারসাম্য বজায় থাকবে।

স্যালাইন কখন দেবেন
চিকিৎসকেরা জানাচ্ছেন, পাঁচ বারের বেশি পাতলা মল হলে তখন স্যালাইনের ব্যবস্থা করতে হবে। পায়খানার সঙ্গে রক্ত বেরুলে

চিকিৎসকের পরামর্শ নিয়ে ‘স্টুল কালচার’ করাতে হবে।

খাবারে নজর দিন
খাওয়াদাওয়ায় বেশি নজর দিতে হবে এই সময়ে। রাস্তার স্ট্রিট ফুড এমনকি ভ্যাপসা গরমের রেহাই দেওয়া লস্যি খাওয়া যাবে না। কাঁচা শাকসবজি খাবেন না, কারণ ব্যাকটেরিয়া সংক্রমণের ঝুঁকি থাকবে। এই সময়ে কোনও অনুষ্ঠান বাড়িতে গেলে সালাদ এড়িয়ে চলাই ভালো। বরং, বাড়িতে বানিয়ে খান। বাইরে থেকে ফল কিনে এনে খেলে, তা ভালো করে ধুয়ে নিন। শাকসবজি ভালো করে সেদ্ধ করে রান্না করুন। শিশুদের শরীরে পটাশিয়াম দ্রুত কমে যায়। তাই লেবুর রস, কলা, স্যুপ জাতীয় খাবার, পেঁপে দিতে হবে। ভিটামিন সি সমৃদ্ধ খাবার বেশি খেতে হবে। এতে শরীরে প্রচুর পরিমাণে অ্যান্টি-অক্সিড্যান্ট ঢুকবে, রোগ প্রতিরোধ ক্ষমতা বাড়বে। লেবু জাতীয় ফল, পেয়ারা বেশি করে খান। খাবারে ওমেগা-থ্রি ফ্যাটি অ্যাসিড থাকলে ভালো। রেড মিটের বদলে মাছ, ডিম, মুরগির মাংস খেতে পারেন।

সূত্র: ইত্তেফাক

আলমডাঙ্গায় চিকিৎসক সংকটে ৩১ শয্যা হাসপাতালে দ্বিগুণ রোগী

এক সপ্তাহ ধরে ঠান্ডা জ্বরে ভুগছিল দেড় বছর বয়সী আফিয়া সুমাইয়া তাবাচ্ছুম। বাড়িতেই টুকটাক চিকিৎসা চলছিল তার। হঠাৎ অবস্থা সংকটাপন্ন হওয়ায় বৃহস্পতিবার সকালে উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে নেওয়া হয়। চিকিৎসক পরীক্ষা করে জানান, নিউমোনিয়া হয়েছে। তবে শয্যা না থাকায় হাসপাতালে রাখেননি। বিকেলে কুষ্টিয়া মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে নেওয়া হয় তাকে।

একই দিন পার্শ্ববর্তী উপজেলার মিরপুর থানার বাসিন্দা আরজিনা বেগম নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত দুই মাসের ছেলেকে নিয়ে আসেন হাসপাতালে। শয্যা না থাকায় বেলা সাড়ে ১১টা পেরিয়ে গেলেও ভর্তি করাতে পারেননি। অসুস্থ ছেলেকে নিয়ে বাসায় ফিরবেন, নাকি জেলার হাসপাতালে যাবেন ভেবে পাচ্ছেন না।

চুয়াডাঙ্গার আলমডাঙ্গা উপজেলায় তীব্র গরমে জ্বর, ঠান্ডা, কাশি, নিউমোনিয়া, ডায়রিয়াসহ বিভিন্ন রোগে আক্রান্ত হচ্ছে মানুষ। বেশি আক্রান্ত হচ্ছে শিশু ও বয়স্করা। বৃহস্পতিবার উপজেলা স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সে গিয়ে দেখা যায়, টিকিটের জন্য অপেক্ষা করছে রোগী ও স্বজনরা। বৃষ্টি উপেক্ষা করেই টিকিট কাউন্টারের সামনে লম্বা লাইন। বহির্বিভাগ ও জরুরি বিভাগের সামনেও ভিড়। সব ওয়ার্ডই রোগীতে পূর্ণ। এরই মধ্যে ৩১ শয্যার হাসপাতালটিতে ভর্তি রয়েছে ৭০ জন রোগী। প্রতিদিনই হাসপাতালে নতুন করে ভর্তি হচ্ছে ১৫ থেকে ২০ জন। এতে বেড়েই চলছে রোগীর চাপ। দ্বিগুণ রোগী হওয়ায় দেখা দিয়েছে শয্যা সংকট। মেঝে-বারান্দায় চাদর ও পাটি বিছিয়ে বসে ও শুয়ে আছে রোগী ও স্বজনরা। প্রচণ্ড গরমে হাঁসফাঁস অবস্থা তাদের। বিছানার পাশ দিয়ে মানুষজন হেঁটে যাচ্ছে। পায়ের ধুলাবালু উড়ে বিছানায় ও নাকেমুখে যাচ্ছে। এ অবস্থায় রোগীদের সামলাতে হিমশিম খাচ্ছেন চিকিৎসক ও নার্সরা।

১৯৬২ সালে ৩১ শয্যার স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সটি স্থাপিত হয়। প্রতিষ্ঠার ৫০ বছর পর ২০১২ সালের ৯ ফেব্রুয়ারি এটিকে ৫০ শয্যায় উন্নীত করা হয়। কিন্তু চাহিদা অনুযায়ী জনবল বাড়ানো হয়নি। এতে এই হাসপাতালে স্বাস্থ্যসেবা ব্যাহত হচ্ছে। বহির্বিভাগ, জরুরি বিভাগসহ প্রতিদিন রোগী দেখা হয়েছে অন্তত ৮০০ জন। এর মধ্যে বহির্বিভাগে এসেছে ৬০০ এবং জরুরি বিভাগে ২০০ জন। গত জুন মাসের তুলনায় জুলাইয়ের শুরু থেকে হাসপাতালে দৈনিক গড়ে ৪০০ রোগী সেবা নিয়েছে। দৈনিক গড়ে ১৫-২০ জন ভর্তি হয়েছে। বর্তমানে ৩১ শয্যার হাসপাতালে ভর্তি আছে ৭৮ জন। তাদের মধ্যে শিশু-বৃদ্ধসহ ১৫ জন নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত। ২৪ ঘণ্টায় বহির্বিভাগে নিউমোনিয়ায় আক্রান্ত ১০ জন ও ডায়রিয়ার ২৯ জন চিকিৎসা নিয়েছে। এ ছাড়া জ্বর, ঠান্ডা ও কাশিতে আক্রান্ত রোগীও আছে।

স্বাস্থ্য কমপ্লেক্সের দায়িত্বে থাকা (আরএমও) নাজমিন সুলতানা কণা জানান, তাপদাহের পর বৃষ্টি হওয়ায় রোগীর চাপ বেড়েছে। পর্যাপ্ত শয্যা না থাকায় অনেক রোগীকে মেঝেতে রেখে চিকিৎসা দেওয়া হচ্ছে। চিকিৎসক সংকট থাকায় প্রত্যেকে ডাবল শিফটে সেবা দিচ্ছেন।

ভেজাল দুধ চিনবেন যেভাবে

বাড়ির বয়স্কদের এক গ্লাস দুধ দিতেই হয়। বাচ্চার জন্যও জরুরি। কিন্তু আজকাল দুধেও মেশানো হয় ভেজাল। চকের গুড়া বা ডিটারজেন্ট-অনেক কিছুই মেশানো হয় দুধে। এই ভেজাল দুধ পেটে গেলে সমস্যা। উপকারের বদলে অপকারটাই অনেক। দোকান থেকে বিশ্বস্ত ব্র্যান্ডের যে দুধ কিনছেন তা কি আসলেই ভালো? বাড়িতেই পরখ করে নেওয়া যাবে সহজে।

বোতল ঝাঁকুনি পরীক্ষা
অল্প কিছুটা দুধ একটা বোতলে নিন। এবার বোতলটা জোরে জোরে ঝাঁকান। ফেনা উঠলে বুঝবেন দুধে ডিটারজেন্ট মেশানো আছে। আর যদি দেখেন ঝাঁকানোর পরেও ফেনা উঠছে না তাহলে বুঝতে হবে তাতে ভেজাল নেই।

মাটিতে পরখ করুন
প্যাকেট থেকে সামান্য একটু দুধ মাটিতে ঢালুন। যদি দেখেন গড়িয়ে গিয়ে মাটিতে সাদা দাগ রেখে যাচ্ছে, তাহলে এ দুধ খাঁটি। অশুদ্ধ হলে মাটিতে সাদা দাগ পড়বে না। ভেজাল দুধ পরীক্ষা করার এই পদ্ধতি অনেক আগে থেকেই গ্রামে ব্যবহার করা হচ্ছে। এবার শহরেও আপনার পরীক্ষা করার সুযোগ এসে গেল।

কার্বোহাইড্রেট মিশিয়েছে কি-না
দুধ জ্বাল দিন বা গরম করার পর কি তা হলদেটে হয়ে যাচ্ছে? তাহলে এটি খাঁটি দুধ হবে না। এই দুধে কার্বোহাইড্রেট মেশানো হয়েছে। আরেকটা পদ্ধতি আছে। একটু দুধ পাত্রে নিয়ে তাতে ২ চা চামচ নুন মেশান। যদি নুনের সংস্পর্শে এসে দুধ নীলচে হয়, তা হলে বুঝবেন, এ দুধে কার্বোহাইড্রেট রয়েছে।

ইউরিয়া আছে কি-না
দুধে ইউরিয়া মেশানো আছে কি না তা ঘরোয়া উপায়ে পরীক্ষা করা কঠিন। তারপরও কাছাকাছি একটা রেজাল্ট পাওয়া যেতে পারে। সেজন্য এক চামচ দুধে সয়াবিন পাউডার মেশান। কিছুক্ষণ রেখে লিটমাস পেপার রাখুন। যদি লিটমাস ডোবাতেই লাল লিটমাস নীল হয়, তাহলে বুঝতে হবে দুধে ইউরিয়া মেশানো আছে।

গুঁড়ো দুধের বেলায়?
গুঁড়ো দুধেও ভেজাল মেশানো হয়। এমনিতেই এই দুধ হলদেটে। আবার

কিছুটা মিহি সাদা। গুঁড়ো দুধের সঙ্গে ডিটারজেন্ট, শ্যাম্পু ইত্যাদি মিশিয়ে তৈরি করা হয় ভেজাল দুধ। গন্ধ-বর্ণ সব কিছু মিলে যায় আসল দুধের সঙ্গে। চিকিৎসকেরা বলছেন, ভেজাল দুধ বানানোর জন্য যেসব উপকরণ ব্যবহার করা হচ্ছে, তার সবটাই শরীরের পক্ষে মারাত্মক ক্ষতিকর।

সূত্র: ইত্তেফাক